# শারহুল আক্বীদা আত্-ত্বহাবীয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৭. আল্লাহ তা‘আলা যা ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া অন্য কিছু হয় না (وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী (রহিমাহুল্লাহ)

আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার প্রকারভেদ এবং সৃষ্টিগত ইচ্ছা ও শরীয়াতগত ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের হক্বপন্থী আলেমগণ বলেন, আল্লাহর কিতাবে আল্লাহ তা‘আলার যে ইরাদাহ বা ইচ্ছার কথা উল্লেখ রয়েছে, তা দু’প্রকার।

(১) ইরাদাহ কাওনীয়া কাদ্রীয়া বা সৃষ্টি ও নির্ধারণগত ইচ্ছা।

(২) ইরাদা শারঈয়া দ্বীনিয়া বা শরীয়াতের আদেশগত ইচ্ছা।

ইরাদায়ে শারঈয়া কেবল ঐ সব বস্তুর মধ্যেই সীমিত, যা হওয়া আল্লাহ তা‘আলা ভালবাসেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট থাকেন।

আর ইরাদায়ে কাওনীয়া হচ্ছে ব্যাপকভাবে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে কার্যকর হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা যা পছন্দ করেন আর যা পছন্দ করেন না, উভয়টিই এর মধ্যে শামিল। এ প্রকার ইচ্ছার বর্ণনা এসেছে আল্লাহ তা‘আলার এ বাণীতে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾

> “অতএব আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্যে তার অন্তকরণ খুলে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তকরণ খুব সংকুচিত করে দেন”। (সূরা আল আন‘আম: ১২৫)

আল্লাহ তা‘আলা সূরা হুদের ৩৪ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

> “এখন যদি আমি তোমাদের কিছু মঙ্গল করতে চাই তাহলে আমার মঙ্গল কামনা তোমাদের কোন কাজে লাগবে না যখন আল্লাহ নিজেই তোমাদের বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা করে ফেলেছেন।[1]

তিনিই তোমাদের রব এবং তারই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।” আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

> কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন”। (সূরা আল বাকারা: ২৫৩)

আর ইরাদা শারঈয়া দ্বীনিয়া বা শরীয়াতের আদেশগত ইচ্ছা সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

> ‘‘আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের পক্ষে যা কঠিন তা তিনি চান না’’। (সূরা আল বাকারা: ১৮৫)

আল্লাহ্ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

> ‘‘আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বর্ণনা করতে, তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের আদর্শসমূহ প্রদর্শন করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান’’। (সূরা আন নিসা: ২৬)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾

> ‘‘আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু যারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে তারা চায় তোমরা ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে দূরে চলে যাও। আল্লাহ তোমাদের উপর সহজ করার ইচ্ছা করেন। কারণ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে’’। (সূরা আন নিসা: ২৭-২৮)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

> ‘‘আল্লাহ তোমাদের উপর সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন না। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে এবং তার নিয়ামত তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করে দিতে, যাতে তোমরা শোকর গুজার হও’’। (সূরা আল মায়িদা:৬)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

> ‘‘আল্লাহ ইচ্ছা করেন তোমাদের নাবী পরিবার থেকে ময়লা দূর করতে এবং তোমাদের পুরোপুরি পাক-পবিত্র করে দিতে’’। (সূরা আহযাব: ৩৩)

আল্লাহ তা‘আলার এ প্রকার ইচ্ছার উদাহরণ মানুষের কথার মধ্যে পাওয়া যায়। তারা কাউকে অন্যায় কাজ করতে দেখলে বলে থাকে, هَذَا يَفْعَلُ مَا لَا يُرِيدُهُ اللَّهُ ‘‘এ লোকটি এমন কাজ করে, যা আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছা করেন না’’। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা তার কাজকে পছন্দ করেন না, ভালোবাসেন না এবং এর আদেশ করেননি।

আর ইরাদায়ে কাওনীয়ার উদাহরণও মুসলিমদের কথার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। তারা বলে থাকে, ‘‘যা কিছু

হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়েছে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেননি, তা হয়নি”।[2]

ইচ্ছাকারী নিজে যা করার ইচ্ছা করে এবং অপরের পক্ষ থেকে যা হওয়ার ইচ্ছা করে, এ উভয় ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কর্ম সম্পাদনকারী যখন নিজে কোনো কাজ করার ইচ্ছা করে তখন এটি হয় তার নিজস্ব কর্ম সম্পর্কীত ইচ্ছা। আর যখন অন্যের পক্ষ হতে কোন কাজ সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করে তখন এ ইচ্ছাটি অন্যের কর্মের জন্য নির্দিষ্ট হয়। এ উভয় প্রকার ইচ্ছাই মানুষের বোধগম্য। আল্লাহ তা‘আলার আদেশ দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রথমটির ক্ষেত্রে নয়। আল্লাহ তা‘আলা যখন তার বান্দাদেরকে কোনো বিষয়ে আদেশ করেন, তখন কখনো কখনো আদিষ্ট ব্যক্তিকে আদেশ বাস্তবায়নের জন্য সাহায্য করার ইচ্ছা করেন।[3]

আবার কখনো কখনো তাকে সাহায্য করার ইচ্ছা করেন না। অথচ তিনি বান্দার পক্ষ হতে আদেশটি বাস্তবায়ন হওয়ার ইচ্ছা করেন।

আল্লাহ তা‘আলার ইরাদা বা ইচ্ছাকে এভাবে শ্রেণী বিন্যাস করার মাধ্যমে তার আদেশের ব্যাপারে মানুষের তর্ক-বিতর্কের অবসান হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার শরীয়াতগত আদেশ বা ইচ্ছা কি তার ইরাদায়ে কাওনীয়া তথা সৃষ্টিগত ইচ্ছার অধিনস্ত? অর্থাৎ শরীয়তের হুকুম কি সকল সৃষ্টির দ্বারাই বাস্তবায়িত হয়?

এর জবাব হলো, না। বরং আল্লাহ তা‘আলা শরীয়াতগত ইচ্ছা দ্বারা যে আদেশ করেন, কারো কারো ক্ষেত্রে তার বিপরীতে সৃষ্টিগত ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহ তা‘আলা রসূলদের জবানে মানুষকে এমন বিষয়ের আদেশ করেছেন, যা তাদের জন্য উপকারী এবং এমন জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন, যা তাদের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ অন্তর দিয়ে ইচ্ছা করে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে যে আদেশ করেছেন আল্লাহ তা‘আলা তা তার জন্য সৃষ্টি করুক। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তার জন্য ঐ কাজটি সৃষ্টি করেন এবং বান্দাকে তার সম্পাদনকারী বানান ও তাওফীক দান করেন।

অন্য দিকে আরেক শ্রেণীর মানুষ ইচ্ছা করে না যে, তার জন্য কর্ম সৃষ্টি করা হোক। ফলে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য কাজ-কর্ম সৃষ্টি করেন না, তাকে কর্ম সম্পাদনকারী বানান না এবং তাকে তাওফীকও দান করেন না।[4]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা কর্তৃক বান্দাদের কাজ-কর্ম সৃষ্টি করা এবং অন্যান্য বস্তু সৃষ্টি করা একই জিনিস। আর বান্দাদেরকে আদেশ করা আরেক জিনিস। এখানে আদেশ করা মানে তাদের জন্য ঐসব জিনিস বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, যাতে বান্দাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর নিষেধ করা মানে তাদের জন্য ঐসব বিষয় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, যা তাদের জন্য ক্ষতিকর।

আল্লাহ তা‘আলা ফেরাউন, আবু লাহাব এবং অন্যান্য কাফেরকে ঈমান আনয়নের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে তাদের জন্য ঈমানের উপকারিতাও বর্ণনা করেছেন। তবে আল্লাহর উপর এটি আবশ্যক ছিল না যে, তাদেরকে ঈমান আনয়ন করতে সাহায্য করবেন। বরং আল্লাহ তা‘আলা যদি তাদের জন্য ঈমান সৃষ্টি করতেন এবং ঈমান আনয়ন করতে তাদেরকে সাহায্য করতেন, তাহলে তার সৃষ্টির মধ্যে এক প্রকার ত্রুটি চলে আসার সম্ভাবনা ছিল। কেননা আল্লাহ তা‘আলা যা সৃষ্টি করেন, তা বিশেষ হিকমতের জন্যই সৃষ্টি করেন।[5]

বান্দাকে যে কাজের আদেশ করা হয়েছে, তা সম্পাদন করাতে বান্দার যে স্বার্থ ও লাভ রয়েছে, আদেশকারী (আল্লাহ তা‘আলা) যখন ঐ কাজটি সৃষ্টি করেন এবং বান্দাকে তার সম্পাদনকারী বানান, তখন তার জন্য সেখানে কোনো লাভ বা স্বার্থ থাকা আবশ্যক নয়।

সুতরাং সৃষ্টি করা এক বিষয়, আর আদেশ করা অন্য বিষয়। কোনো কোনো মানুষ অন্যের কল্যাণ কামনা করতে গিয়ে তাকে আদেশ-নিষেধ করে থাকে ও তার জন্য উপকারী বিষয় বর্ণনা করে। এত কিছু করা সত্ত্বেও তাকে ঐ আদেশ বা নিষেধ বাস্তবায়নে সাহায্য করার ইচ্ছা করে না। কেননা আপনি অন্যকে যে আদেশ করেন কিংবা তাকে যে উপদেশ দেন তাতে আপনার যে স্বার্থ থাকে, তা বাস্তবায়নে তাকে সাহায্য করতে গেলে আপনার সে স্বার্থ ছুটে যেতে পারে। শুধু তাই নয়; বরং আদেশ বা উপদেশের বিপরীত করার মধ্যেই আপনার স্বার্থ থাকতে পারে। সুতরাং অন্যের কল্যাণ কামনা করতে গিয়ে মানুষ অন্যকে যে আদেশ বা উপদেশ প্রদান করে তা এক জিনিস, আর নিজের জন্য যে কাজ করে তা ভিন্ন বিষয়। সুতরাং অন্যের জন্য মানুষের আদেশ এবং তার নিজের কর্মের ক্ষেত্রে যেখানে এ পার্থক্য করা সম্ভব, সেখানে আল্লাহ তা‘আলার আদেশ এবং তার নিজের কাজ-কর্মের মধ্যে পার্থক্য করা আরো উত্তমভাবেই সম্ভব।

মুতাযেলারা ঐ ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করে থাকে, যে ব্যক্তি অন্যকে নিজের আদেশ প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে আদেশ দাতা অবশ্যই এমন কিছু করতে বাধ্য, যাতে করে আদিষ্ট ব্যক্তি তার কাজটি সম্পাদন করার প্রতি উৎসাহ পায়। যেমন আদিষ্ট ব্যক্তির সাথে হাসিমুখে ও প্রফুল্লস্ন মনে কথা বলা এবং কাজ সম্পাদন করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা ও বিভিন্নভাবে পৃষ্টপোষকতা প্রদান করা ইত্যাদি।

তাদের জবাবে বলা যেতে পারে যে, এ সাহায্য দু’কারণে করা যেতে পারে।

(১) আদেশ বা উপদেশ প্রদানকারীর যদি সেখানে কোন স্বার্থ নিহিত থাকে। যেমন রাজা তার সেনাপতিকে এমন কাজের আদেশ করলেন, যাতে তার রাজ্যের ভিত্তি মজবুত হয়, মনিব তার চাকরকে এমন কাজ করার আদেশ করলেন, যাতে তার পরিবারের কার্যাদি ঠিক-ঠাক মত চলে, যৌথ কাজের শরীক ব্যক্তি তার অংশীদারকে এমন কিছু করতে বলল, যাতে উভয়েরই স্বার্থ সম্পৃক্ত রয়েছে এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়।

(২) আদেশ দাতা সম্ভবত এমন হবে যে, তিনি আদিষ্ট ব্যক্তিকে আদেশ বাস্তবায়নে সাহায্য করলে তার নিজের লাভ রয়েছে। যেমন সৎকাজের আদেশকারীর উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। তিনি নেকী ও তাকওয়ার কাজে কাউকে আদেশ করার সাথে সাথে আদিষ্ট ব্যক্তিকে সহযোগিতাও করে থাকেন। কারণ তিনি অবগত আছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে আনুগত্যের কাজে সাহায্য করার কারণে ছাওয়াব দিবেন। তিনি আরো অবগত আছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা বান্দাকে ততক্ষণ সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে।[6]

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার উপর তাকে আনুগত্যের কাজে সাহায্য করা জরুরী নয়। কিন্তু তার অনুগ্রহের দাবিতে কেবল তাকেই সাহায্য করেন এবং আনুগত্যের তাওফীক দেন, যে অন্তর দিয়ে আল্লাহর কাছে তা কামনা করে।

আর যখন জানা যাবে যে, আদেশকারী শুধু আদিষ্ট ব্যক্তির উপকারের জন্যই আদেশ করেছে, এ জন্য নয় যে, আদিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা আদেশ বাস্তবায়ন হলে আদেশকারীর কোন লাভ হবে না, তখন আদিষ্ট ব্যক্তিকে আদেশ বাস্তবায়নে সাহায্য করা জরুরী হয় না। যেমন সৎকাজের আদেশদানকারী কিংবা উপদেশ প্রদানকারী যদি মনে করে আদিষ্ট ব্যক্তিকে সৎকাজ বাস্তবায়নে সাহায্য করলে আদেশকারীর জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না, এমনকি আদিষ্ট কাজে সহযোগিতা করতে গেলে আদিষ্ট ব্যক্তির স্বার্থ হাসিল হলেও আদেশ দাতার ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, তাহলে সেক্ষেত্রে সাহায্য না করাই উচিত। যেমন ফেরাউন গোত্রের যে লোকটি ঈমান গোপন রেখেছিল, সে শহরের শেষপ্রান্ত থেকে দাড়িয়ে এসে মুসা (আ.) কে বলেছিল,

﴿يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾

> হে মূসা! ফেরাউন গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ চলছে। এখান থেকে বের হয়ে যাও। আমি তোমার কল্যাণকামীদের একজন (সূরা কাসাস: ২০)।

সুতরাং লোকটির স্বার্থ এখানেই ছিল যে, সে শুধু মুসা আলাইহিস সালামকে শহর ছেড়ে চলে যেতে বলবে। চলে যাওয়ায় সাহায্য করাতে তার কোনো লাভ ছিল না। এমনকি সাহায্য করলে ফেরাউন গোত্রের লোকেরা তার ক্ষতি করতো।

অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, লোকটি যদি মুসা আলাইহিস সালামকে চলে যেতে সাহায্য করতো, রাস্তা দেখিয়ে দিতো কিংবা হাতে ধরে নিয়ে যেতো অথবা নিজের বাহনের উপর বসিয়ে শহর থেকে বের করে মাদায়েনের পথ দেখিয়ে দিতো, তাহলে ফেরাউন ও তার লোকেরা ঘটনা জানতে পারলে লোকটির ক্ষতি করার আশঙ্কা ছিল। তাই সে শুধু বলে দিয়েছে যে, শহরে থাকলে ফেরাউনের লোকেরা তোমাকে হত্যা করে ফেলবে। বের হয়ে যাওয়া ছাড়া তোমার বাঁচার কোন পথ নেই। সুতরাং তুমি দ্রুত বের হয়ে যাও। আমি তোমার কল্যাণ কামনা করছি এবং তোমার প্রাণ নাশের আশঙ্কা করছি। এরূপ উদাহরণ অনেক রয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দাদেরকে এমনসব আদেশ করেছেন, যা বাস্তবায়নে তাদের কল্যাণ রয়েছে। তবে এর অর্থ এ নয় যে, তাদেরকে আদেশ বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করা আল্লাহর উপর আবশ্যক। অথচ তিনি সাহায্য করতে সক্ষম।

মুতাযেলারা বলেছে, আল্লাহ তা‘আলা কাউকে কর্ম সম্পাদনকারী বানানোর সক্ষম নয় বলেই তিনি সাহায্য করেন না। তাদের এ কথা সম্পূর্ণ বাতিল। আল্লাহ তা‘আলা যা করেন তার মধ্যে বিরাট হিকমত রয়েছে। তার আদেশের মধ্যেও রয়েছে হিকমত। যদিও আমরা সেই হিকমতগুলো জানি না।

আল্লাহর সৃষ্টির একজন অন্যজনকে যখন আদেশ করে, তখন সে আদেশের মধ্যে আদেশকারীর হিকমত ও বিশেষ স্বার্থ থাকে, আর আদেশ বাস্তবায়নে আদিষ্ট ব্যক্তিকে সাহায্য করতে গেলে সে হিকমত অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক থাকে না; বরং কোনো রকম সাহায্য না করাই কখনো কখনো হিকমতের দাবি বলে গণ্য হয়। যাকে আদেশ বা উপদেশ প্রদান করা হয় সে আদেশকারীর অত্যন্ত প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় আদেশ বাস্তবায়নে আদেশকারীর সাহায্যের হকদার হয় না। যেমন পিতা তার ছেলেকে এক খন্ড যমীন ক্রয় করে দিয়ে ছেলের কল্যাণের জন্য যমীনে চাষ করা ও বীজ বপন করার আদেশ দিলো। কিন্তু এখানে ছেলের যমীনে পিতা নিজে গিয়ে চাষ করা ও বীজ বপন করা আবশ্যক নয় এবং এতে কোনো স্বার্থ, হেকমত ও কল্যাণ নিহিত নেই।

সুতরাং সৃষ্টির কাজের মধ্যে যেহেতু কখনো কখনো হিকমত ও কল্যাণের দাবি এ থাকে যে, তাদের কেউ অন্যের কল্যাণার্থে আদেশ বা উপদেশ প্রদান করে এবং সে আদেশ-উপদেশ বাস্তবায়নে সাহায্য না করাতেই কখনো কখনো যেহেতু আদেশকারীর হিকমত ও কল্যাণ ঠিক থাকে, তাই স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ বাস্তবায়নে সৃষ্টিকে সাহায্য না করা আরো বেশী যুক্তিযুক্ত।[7]

মূলকথা হলো, বুদ্ধিমান মানুষের ক্ষেত্রে যেহেতু এটি সম্ভব যে, সে অন্যকে কোন বিষয়ে আদেশ করে এবং তাকে আদেশ বাস্তবায়নে কোনো প্রকার সাহায্য করে না, তাই স্রষ্টার পক্ষে আরো উত্তমভাবেই সম্ভব যে, তিনি বান্দাদেরকে আদেশ করবেন এবং বিশেষ হিকমত থাকার কারণে তাদেরকে আদেশ বাস্তবায়নে সাহায্য করবেন

না।

সুতরাং যাকে তিনি আদেশ করেছেন এবং আদেশটি বাস্তবায়নে সাহায্য করেছেন, তার ক্ষেত্রে কথা হলো সে আদেশটির ক্ষেত্রে আল্লাহর ইরাদায়ে কাওনীয়া (সৃষ্টিগত ইচ্ছা) এবং ইরাদায়ে শারঈয়া (আদেশগত ইচ্ছা) উভয়েরই সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ তার জন্য কাজটি সৃষ্টি করেছেন এবং তার দ্বারা তা বাস্তবায়ন হওয়া পছন্দ করেছেন। কাজেই তার কাজের মধ্যে আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছা এবং আদেশগত ইচ্ছা উভয়ই বাস্তবায়িত হয়েছে।

আর যাকে আদেশ দেয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আদেশ বাস্তবায়নে সাহায্য করা হয়নি, সে আদেশের সাথে শুধু আল্লাহর শরীয়াতগত ইচ্ছার সম্পর্ক রয়েছে, সৃষ্টিগত ইচ্ছার কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ আদেশ দেয়া হলেও কাজটি তার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। কেননা তার জন্য কাজটি সৃষ্টি করা হিকমতে ইলাহীয়ার দাবি ছিল না; বরং হিকমতে ইলাহীর দাবি ছিল তার বিপরীত বিষয় সৃষ্টি করা।[৪]

পরস্পর বিপরীতমুখী দু’টি জিনিসের ক্ষেত্রে কথা হলো একজনের মধ্যে তা থেকে একটি সৃষ্টি করা হলে একই সময় তার মধ্যে তার বিপরীতটি সৃষ্টি করা হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ রোগ-ব্যাধি ও সুস্থতা সৃষ্টির বিষয়টি পেশ করা যেতে পারে। বান্দার মধ্যে রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করলে সে তার রবের সামনে নতি স্বীকার করে, বশীভূত হয়, আল্লাহর কাছে দু‘আ করে ও তাওবা করে। সেই সঙ্গে তার গুনাহ্র কাফফারা হয়, তার অন্তর নরম হয়, তার অহমিকা-দাম্ভিকতা দূর হয় এবং মানুষের উপর যুলুম করা থেকেও বিরত থাকে।

সুস্থতা সৃষ্টি করা এর বিপরীত। শুধু সুস্থতা সৃষ্টি করলে এবং আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে রোগ-ব্যাধি বালা-মুছীবত না থাকলে উপরোক্ত বিরাট উপকার ও স্বার্থগুলো হাসিল হতো না। মানুষকে সবসময় নেয়ামত, সুস্বাস্থ্য, আনন্দ-ফুর্তি ও প্রাচুর্যের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে এ উপকার হাসিল হতো না। মুতাযেলারা আল্লাহ তা‘আলার কর্মের হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে ভুল তরীকা অবলম্বন করেছে এবং তাতে আল্লাহ তা‘আলাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে ফেলেছে। তারা মূলতঃ আল্লাহ তা‘আলার কর্মের কোনো হিকমতই সাব্যস্ত করেনি।

## ফুটনোট

[1]. অর্থাৎ আল্লাহ যদি তোমাদের হঠকারিতা, দাম্ভিকতা এবং সদাচারে আগ্রহহীনতা দেখে এ ফায়সালা করে থাকেন যে, তোমাদের সঠিক পথে চলার সুযোগ আর দেবেন না এবং যেসব পথে তোমরা উদ্ভ্রামেত্মর মতো ঘুরে বেড়াতে চাও, সেসব পথে তোমাদের ছেড়ে দেবেন তাহলে এখন আর তোমাদের কল্যাণের জন্য আমার কোন প্রচেষ্টা সফলকাম হতে পারে না।

[2]. এমনকি মানুষেরা ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত মানুষকে শান্তনা দিতে গিয়ে বলে থাকে যে, ধৈর্য ধরো, সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়, আল্লাহর কাজ সবই ভালো...ইত্যাদি। এসবগুলোই ইরাদায়ে কাওনীয়ার উদাহরণ। এতে আল্লাহর পছন্দ ও ভালোবাসা থাকা আবশ্যক নয়।

[3]. অর্থাৎ বান্দাকে আল্লাহ তা‘আলা যে স্বাধীনতা ও শক্তি দিয়েছেন, তার সঠিক ব্যবহার করে যখন ভালো কাজের দিকে অগ্রসর হওয়ার নিয়ত করে এবং সেদিকে এগিয়ে যায় তখন আল্লাহ তা‘আলা তাকে ভালো কাজের

তাওফীক দেন ও সাহায্য করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য যেই স্বাধীনতা ও শক্তি দিয়েছেন, তার অপব্যবহার করে যখন সে নিজেই অপরাধের দিকে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা করে, তখন তাকে জোর করে তা থেকে ফিরিয়ে আনা হিকমতে ইলাহীয়ার পরিপন্থী। (আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

[4]. ইরাদা শারঈয়া ও ইরাদা কাউনীয়ার মধ্যকার পার্থক্য হলো, ইরাদায়ে শারঈয়া কখনো বাস্তবায়িত হয় আবার কখনো বাস্তবায়িত হয় না। কিন্তু ইরাদায়ে কাউনীয়া বাস্তবায়িত হওয়া জরুরী। সে হিসাবে ইরাদায়ে শারঈয়া ইরাদায়ে কাওনীয়ার মধ্যে শামিল নয়। কিন্তু যেখানে আল্লাহর ইরাদায়ে শারঈয়া বাস্তবায়িত হয়, সেখানে কাওনীয়াও দাখিল থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে ঈমান আনার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু সকল মানুষ ঈমান আনয়ন করেনি। যারা ঈমান এনেছে, তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর ইরাদায়ে কাওনীয়া ও শরঈয়া উভয়ই বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য ঈমান সৃষ্টি করেছেন এবং তা গ্রহনের তাওফীকও দিয়েছেন। অন্য দিকে কাফেররা ঈমানের আদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পরও ঈমান আনেনি। তাদের মধ্যে শুধু আল্লাহর ইরাদায়ে কাওনীয়া বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছাই তাদের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থাৎ কুফরীও আল্লাহর সৃষ্টি এবং তারা শুধু এ সৃষ্ট বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে। এ বিষয়কে অধিকতর পরিষ্কার করার জন্য আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ঈমান ও আবু জাহেলের কুফরীর দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। আবু বকরের মধ্যে আল্লাহর সৃষ্টিগত ও শারঈয়তগত উভয় ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে ঈমান আনার আদেশ দিয়েছেন এবং তার অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করেছেন। ঐদিকে আবু জাহেলকেও ঈমান আনয়নের আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তার অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করেননি; বরং কুফরী সৃষ্টি করেছেন। সে কুফরী করেছে। সে হিসাবে তার দ্বারা শুধু আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়েছে। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

[5]. বিষয়টি সহজভাবে বুঝানোর জন্য কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। যেমন ধরুন কুরাইশ নেতা ও মক্কার প্রভাবশালী ব্যক্তি আবু তালিবের ঈমান না আনা এবং কিয়ামতের দিন তার শাস্তি ভোগ করার উদাহরণটি পেশ করা যেতে পারে। সম্ভবত তার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার হিকমতটি এমন ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার বাপ-দাদাদের দ্বীনের উপর রেখেই তার দ্বারা তার প্রিয় বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেফাজত করবেন এবং মুসলিমদের চরম বিপদের সময় এমন কল্যাণ সাধন করবেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত ইতিহাসে লিখা থাকবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আবু তালেবকে তার পিতৃধর্মে লিপ্ত রেখে মুসলমানদের জন্য প্রচুর কল্যাণ সাধন করেছেন। কিন্তু সে যেহেতু তার ভাতিজার নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি, তাই আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচারের কারণেই পরকালের নেয়ামত তার ভাগ্যে জুটবে না।

এমনি বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে বুঝানোর জন্য খিযির (আ.) কর্তৃক মিসকীন লোকদের নৌকা ছিদ্র করা ও একজন নিরপরাদ শিশুকে হত্যা করার উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। এর পিছনে আল্লাহ তা'আলার কি হিকমত লুকায়িত ছিল- মুসা (আ.) প্রথমে বুঝতে পারেননি বলেই তিনি খিযির (আ.)এর কাজের জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। পরক্ষণেই খিযির (আ.) স্বীয় কর্ম-কান্ডের হিকমত স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। মূলতঃ শুধু ক্ষতির জন্যই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় কোনো অন্যায় কর্ম সংঘটিত হয় না। আল্লাহর প্রত্যেকটি কাজের পিছনেই

কোন না কোন হিকমত ও কল্যাণ থাকে।

নৌকা ছিদ্র করা মিসকীন লোকদের জন্য ক্ষতিকর, কিন্তু তার মধ্যে যে কল্যাণ রয়েছে, তা সে ক্ষতির চেয়ে বহুগুণ উপকারী। কারণ ভালো নৌকাগুলো যালেম বাদশাহর লোকেরা ছিনিয়ে নেয়। ত্রুটিপূর্ণ নৌকার উপর তারা হস্তক্ষেপ করে না। সুতরাং নৌকা একেবারেই না থাকার চেয়ে ছিদ্র অবস্থায় তা থাকা তাদের জন্য কল্যাণকর।

খিযির (আ.) যেহেতু জানতে পারলেন ছেলেটি বড় হয়ে কাফের হবে এবং পিতামাতাকে কষ্ট দিবে, তাই হত্যা করা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অন্যায় হলেও এ হত্যাকান্ডের পিছনেই রয়েছে ছেলেটি এবং তার পিতামাতার জন্য কল্যাণকর পরিণতি। ছেলেটির জন্য এ বয়সে নিহত হওয়া এ দিক থেকে উপকারী যে, এখনো তার দ্বারা কোনো অন্যায় কাজ হয়নি। সে নিহত হওয়ার পর জান্নাতে যাবে। অপরপক্ষে বড় হয়ে কুফুরী ও পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামে যাওয়া তার জন্য ক্ষতিকর ছিল। ঐ দিকে আল্লাহ তা‘আলা তার বিনিময়ে পিতামাতাকে এমন সৎ সন্তান দান করবেন, যারা পিতামাতার প্রতি আনুগত্য থাকবে।

এমনি প্রচুর বৃষ্টি অনেক সময় কারো জন্য ক্ষতিকর হলেও তাতে সা মানুষের জন্য প্রচুর কল্যাণ থাকে। অনেক সময় বন্যায় কারো ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। বাড়িঘর নষ্ট হওয়া অবশ্যই তাদের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু এর মধ্যেও তাদের কল্যাণ থাকতে পারে। যেমন ধরুন ঝড়ে কোন গ্রামের কতিপয় লোকের বাড়িঘর ধ্বংস হলো আবার কারো বাড়িঘর অক্ষত রইল। যাদের বাড়িঘর নষ্ট হলো তারা মনক্ষুন্ন হলো। আর যাদের বাড়িঘর নষ্ট হলো না, তারা খুশী হলো। পরক্ষণই যখন সরকারী ঘোষণা আসল, যাদের বাড়িঘর নষ্ট হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে উত্তরায় একটি বাড়ি দেয়া হবে, তখন যাদের বাড়িঘর ধ্বংস হয়নি, তারাও কামনা করতে লাগলো যে, তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হলেই ভাল হতো। সুতরাং আল্লাহর প্রত্যেক কাজই ভাল। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোনো কোনো কাজ ক্ষতিকর দেখা যায়।

আল্লাহ তাআলা মদপানসহ অন্যান্য সকল ক্ষতিকর কাজ সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। ইচ্ছার স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর এ নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে মানুষ মদপানে লিপ্ত হতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। শুধু তাই নয় এ তাওবাও তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি এবাদতে পরিণত হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মদ পান করে শুধু আল্লাহর নাফরমানী করা হোক এ জন্যই আল্লাহর ইচ্ছায় মদ সৃষ্টি হয়নি; বরং সৃষ্টি করা হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য। যাতে ভুল করে মদ পান করা হলেও তা থেকে তাওবা করে মদ্যপায়ী আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হতে পারে।

মোটকথা, আল্লাহ তা‘আলা অযথা কোন কিছুই সৃষ্টি করেন না এবং তার কোনো কর্মও হিকমত ছাড়া সংঘটিত হয় না। যা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বুঝতে পারি না। তাই আমাদের সকল অবস্থাতেই আল্লাহর প্রশংসা করা আবশ্যক।

[6]. উপরোক্ত ক্ষেত্রে আদেশকারীর উপর আবশ্যক হলো, তিনি স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য আদিষ্ট ব্যক্তিকে সাহায্য করবেন। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তার আনুগত্য করার আদেশ করেছেন। বান্দার আনুগত্য থেকে আল্লাহ তা‘আলা কি কিছু লাভ করেন বা তাতে আল্লাহর কোনো স্বার্থ রয়েছে যে, বান্দাকে আনুগত্যের উপর সাহায্য করা আল্লাহর

উপর আবশ্যক? বান্দার ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি আল্লাহ তা‘আলা মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ তা‘আলা হাদীছে কুদসীতে বলেন,

«يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِى مُلْكِى شَيْئًا يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئًا يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِى فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِى إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِى إِنَّمَا هِىَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ»

‘‘হে আমার বান্দারা! তোমাদের সর্বপ্রথম, সর্বশেষ, তোমাদের সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত জিন মিলে যদি তোমাদের সর্বাধিক মুত্তাকী ব্যক্তির অন্তরে একত্রিত হয়ে যায় অর্থাৎ তোমাদের সকলের তাকওয়া যদি আল্লাহর সর্বোত্তম বান্দার তাকওয়ার মত হয়ে যায় তাহলে উহা আমার রাজত্বের মধ্যে কিছুই বাড়াতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের সর্বপ্রথম, সর্বশেষ, তোমাদের সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত জিন মিলে যদি সর্বাধিক নিকৃষ্ট বান্দার অন্তরে একত্রিত হয়ে যায় অর্থাৎ তোমাদের পাপাচার ও অবাধ্যতা যদি ইবলীসের অবাধ্যতার মত হয়ে যায়, তাহলেও তা আমার রাজত্ব ও ক্ষমতার কিছুই কমাতে পারবে না।

হে আমার বান্দারা! তোমাদের সর্বপ্রথম, সর্বশেষ, তোমাদের সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত জিন মিলে যদি একটি মাঠে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চায়, আর আমি যদি তাদের প্রত্যেকের প্রার্থনা অনুপাতে দান করি, তাহলেও আমার ভান্ডার থেকে কেবল ঐ পরিমাণই কমতে পারে যেমন সাগরে একটি সুই ঢুকালে তা যে পরিমাণ পানি কমিয়ে দেয়।

হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের আমলগুলো তোমাদের জন্যই সংরক্ষণ করে রাখবো। অতঃপর পরিপূর্ণরূপে তার বিনিময় প্রদান করবো। সুতরাং যে ব্যক্তি ভালো কিছু পায় অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে ভালো আমল করার তাওফীক পেয়ে আমল করতে সক্ষম হয় এবং সে আমলের বিনিময়ে ছাওয়াব, নেয়ামত ও পবিত্র জীবন পেয়ে সৌভাগ্যবান হয়, সে যেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে তার বিপরীত কিছু পায় অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির উপর নিজের কুপ্রবৃত্তির চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়ার কারণে আল্লাহর নেয়ামতের কুফুরী করে এবং তার হুকুমের প্রতি আত্মসমর্পন না করার কারণে খারাপ পরিণামের সম্মুখীন হবে, সে যেন কেবল নিজের নফসকেই দোষারোপ করে।

[7]. আল্লাহ তা‘আলা নাবী-রসূলদের মাধ্যমে সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর ও ক্ষতিকর সবকিছু সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন এবং হেদায়াতের সকল দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন ও কিতাব নাযিল করেছেন। তিনি কল্যাণের পথে চলার আদেশ করেছেন এবং ক্ষতিকর পথে অগ্রসর হতে নিষেধ করেছেন। উভয় পথের যে কোন একটি গ্রহণ করার ক্ষমতা ও স্বাধীনতাও তাদেরকে দিয়েছেন। অতঃপর তার জন্য এটি আবশ্যক ছিল না যে, তিনি তাদেরকে কল্যাণের পথে চলতে সাহায্য করবেন ও তাদেরকে জোর করে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবেন এবং তাদেরকে অন্যায়ের অগ্রসর হওয়ার পথে বাধা প্রদান করবেন। এতে আল্লাহর কোন লাভও নেই। এটি করা হলে সৃষ্টির পিছনে তার হিকমত ও উদ্দেশ্য ঠিক থাকতো না এবং ন্যায় বিচারও ছুটে যেতো। সুতরাং হিকমতের দাবি হলো

সাহায্য না করেই তাদের ইচ্ছা, স্বাধীনতা ও বোধশক্তির উপর ছেড়ে দেয়া এবং সৎকাজ বা পাপাচার কোনটির উপর বাধ্য না করা। কেননা তিনি সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করার জন্য এবং ছাওয়াব ও শাস্তি দেয়ার জন্য। এ হিকমত বজায় রাখার জন্য তাদেরকে স্বাধীনতা দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। স্বাধীনতা না দিয়ে আদেশ বাস্তবায়নে সাহায্য করা হলে এবং বাধ্য করে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা হলে পৃথিবীতে একজন কাফেরও পাওয়া যেতো না। এতে করে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করাও অনর্থক হতো এবং পরীক্ষার মূলনীতি ও ন্যায় বিচার ছুটে যেতো। এমনকি নাবী-রসূল প্রেরণ করা, কিতাব নাযিল করা এবং শরীয়ত নির্ধারণ করা সবই নিরর্থক হতো। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)।

[৪]. উদাহরণ স্বরূপ এখানে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহুর ঈমান আনয়ন এবং আবু জাহেলের কুফরীর বিষয়টি পেশ করা যেতে পারে। তাদের উভয়ের প্রতিই ঈমান আনয়নের আদেশ ছিল। কিন্তু আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঈমান আনয়ন করেছেন। আবু জাহেল ঈমান আনেনি। কারণ আবু বকরের জন্য তিনি ঈমান পছন্দ করেছেন এবং তার জন্য তা সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তার ঈমান আনয়নের মধ্যে আল্লাহর শরীয়াতগত ইচ্ছা এবং সৃষ্টিগত ইচ্ছা উভয়ই বাস্তবায়িত হয়েছে। ঐদিকে আবু জাহেলের ক্ষেত্রে ঈমানের আদেশ ছিল ঠিকই, কিন্তু বিশেষ হিকমত ও আদলের দাবির কারণে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা ঈমান সৃষ্টি করেননি। কী কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়াত করেননি, তার জবাব আমরা এ বইয়ের বিভিন্ন স্থানে এবং শারহুল আকীদাহ আল ওয়াসেতীয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রদান করার চেষ্টা করেছি। সে অংশগুলো মনোযোগসহ পড়ার অনুরোধ রইলো। কারণ তাতে জ্ঞান পিপাসুর জন্য বিরাট উপকার রয়েছে এবং তার দ্বারা তাকদীর সম্পর্কিত বহু প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করা সম্ভব। (আল্লাহ তাআলাই তাওফীক দাতা)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8880

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন